পানপাতিয়া অভিযান (শেষ পর্ব)

সুমন্ত রায়

বদ্রী থেকে কেদার প্রবাদ-পথের দুটি অংশ। প্রথম পর্বে (বদ্রী - মদমহেশ্বর), শেষ পর্বে (মদমহেশ্বর – কেদার)। প্রবাদপথের শেষ অংশ মদমহেশ্বর থেকে কেদার (ইয়াংবুক, মহাপন্থ ও বৈশালী কল) প্রচলিত ট্রেক পথ। এই প্রবাদ পথে (বদ্রী থেকে মদমহেশ্বর) যাওয়ার সহজতর পথ খোঁজাখুঁজির চেষ্টা চলেছিল সেই ১৯৩৪ থেকে...

সকালের দিকে ডালিয়া খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম সকলে। আগের দিন পাপ্পুর একটু শরীর খারাপ হয়েছিল, কিন্তু আজ একদম ঠিক আছে। আজ (১২ সেপ্টেম্বর) হিসেব মত পাস ক্রস করা হবে। কিন্তু ওয়েদার সাথ না দিলে কী হবে কিছু জানা নেই। কিছুক্ষন চলার পরেই এলো একটা বিশাল মুখ হাঁ করা ক্রিভাস, বেশ বেগ পেতে হ'ল। ক্রমশ বাড়তে থাকলো ক্রিভাসের সংখ্যা। আমরা একটা রোপ-এ। ওদিকে সুনীল, দেবেন্দার আর মনীশ আরেকটা রোপ-এ। আমাদেরকে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে ওরা গেল পথ খুঁজতে। এত ক্রিভাসের মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা বেশি। তথাকথিত পথ অনেকটাই উত্তর-পশ্চিম দিকে চৌখাম্বার গা ধরে পানপাতিয়া কলের দিকে যাওয়া হয়। আমরা অনেকটাই দক্ষিণদিকে রয়েছি। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সুনীল এলো। একটু কঠিন পথে ক্রিভাস এড়িয়ে আমরা নেমে আসি স্নো-ফিল্ডের কিছুটা নিচের দিকে যেখান থেকে উঠে গেলে বেশ সেফ জোন। অপেক্ষাকৃত কম ঢাল ধরে আমরা চলছি। পথ বোঝা যাচ্ছে না। হোয়াইট আউট-এর মধ্যে দিশেহারা আমরা ন'জন দাঁড়িয়ে আছি স্থানুবৎ। আকাশ আর বরফের সাদা রঙে চারদিক একাকার। সামনে মাত্র বিশ-তিরিশ ফুট ভিসিবিলিটি। এর পর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার মধ্যে শুরু হয়ে গেছে স্নো-ফল। অগত্যা সুনীল আর দেবেনদ্রজি মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, আজ আর এক পা-ও এগোনো নয়। এখানেই টেন্ট পড়বে।

সময় বিকেল ৪ টে, কিন্তু তখনও সাপোর্ট মেম্বাররা এসে পৌঁছায়নি। বোঝা যাচ্ছে না কখন আসবে। একটা তাঁবু-তে সবাই মিলে ঢুকলাম কোনওরকমে। কোথায় আছি, কল থেকে কত দূরে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যাক, সাপোর্ট মেম্বাররা আসার পর সব তাঁবু পাতা হ'ল। সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করে। গরম চা, স্যুপ খেয়ে শরীর কিছুটা চাঙ্গা করে বাইরে বেরোই। চারদিক চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। সৌম্যর কথাতে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি আকাশে আকাশগঙ্গা! সে যেন আমাদের পথ দেখাচ্ছে। পানপাতিয়া কল সামনেই। কয়েক ঘন্টার পথ। আমাদের সামনে স্বদর্পে দাঁড়িয়ে চৌখাম্বা। বিশালতার অর্থ কী জানা ছিল না, এত কাছে থেকে চৌখাম্বা পর্বত না দেখলে হয়তো জানাও হতো না। চোখ ধাঁধিয়ে যায় আরকি। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে দেখি প্রকৃতির অপার সৃষ্টি। তার রূপ, রস, গন্ধ যেন রক্তে মিশে যাচ্ছে। ক্যামেরা আছে সঙ্গে, কিন্তু এ সৃষ্টি সব ধরা ছোঁয়ার উর্ধ্বে। মনের ক্যামেরায় স্বল্প কিছু বন্দী হয়ে থাকে।

সৌম্য আর পাপ্পু অনেক্ষন বাইরে ছিল। ওরা দারুণ কিছু ছবিও তুলেছে। যাই হোক, আশা করা যায় আগামী কাল ওয়েদার ভালো থাকবে। রাতে খেয়ে শুয়ে পড়লাম সবাই ফুরফুরে মন নিয়ে।

১৩ তারিখ সকাল রোদ ঝলমলে। রোদ বরফে ঠিকরে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সবখানে যেন মনে হচ্ছে মণি মুক্তো ছড়ানো। সামনেই দুধ সাদা চৌখাম্বা। চৌখাম্বার চার শিখর ২৩,০০০ থেকে ২৩,৫০০ ফুটের উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সকাল ন'টায় বেরিয়ে ঠিক দশটায় আমরা পানপাতিয়ার মাথায় (১৭,৩৫৮ ফুট)! সবাই আনন্দে আত্মহারা। এই তো, আমরা পেরেছি। অনেক বাধা-বিপত্তি, প্রতিকূলতা, সব একযাত্রায় পেরিয়ে সচেতন ভাবে, অত্যন্ত সাবধানে আমরা এসে পৌঁছেছি আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে। আমি নিজে গতবছরের দুর্ঘটনার পর থেকে অনেক লড়াই করেছি দাঁতে দাঁত চেপে। আজকের এই দিনটার জন্য। যখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণে এসে পৌঁছলাম, চোখের জল বাঁধ মানলো না। জড়িয়ে ধরে সুনীল আর দেবেন্দ্রজি।

টিম পানপাতিয়া ২০২২

সুনীল অত্যন্ত ভালো মানুষ, তেমনি আমাদের কো-গাইড দেবেন্দ্রজি। বাড়ির বড়দের মত করে সামলে চলেছে পুরো দলটা-কে । সব আবদার হাসিমুখে শোনে, কখনও কোনও কিছুতে না নেই, সর্বক্ষণ অমলিন, ক্লান্তিহীন। ওঁকে দেখলে কেমন মন ভালো হয়ে যায়। যাক, এবার আমাদের নামার পালা।

রোপ সাপোর্ট নিয়ে ধীরে ধীরে খাড়া উৎরাই ধরে নামছি সবাই। আলগা পাথর মাঝে মাঝেই পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে। বেশ লম্বা কসরতের শেষে একটা আইস প্যাচ-এর কাছে নেমে তার বরফে পা ফেলে সাবধানে নামছি সবাই। এর পর গ্লেসিয়ার ধরে বেশ কিছুটা নেমে চলে এলাম অসিত তাল (১৪,৪০০ ফুট) এর কাছে। এটি মার্কেন্ডেয় গঙ্গার উৎসস্থল। আমরা পানপাতিয়া কল থেকে নেমে দক্ষিণ দিক বরাবর চলেছি। অসিত তাল থেকে সবে নামতে শুরু করেছি, তখনই ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি। অনেকটা নিচে নেমে আবার চড়াই।

এখন বোল্ডারের এর সাম্রাজ্য, সব ভীষন নড়বড়ে। খুব সাবধানে পা ফেলে উঠছি। কারোর শরীরে আর শক্তি নেই, বৃষ্টিরও যেন বিরাম নেই। তার মধ্যে একটার পর একটা রিজ পেরিয়ে চলেছি। আমাদের অনেকে পিছনে, আমি আর পাপ্পু একটু এগিয়ে। পাপ্পু অনবরত সাহস যুগিয়ে চলেছে আমাকে। ওর জন্যই এগোতে পারছিলাম। অবশেষে দূরে দেখতে পেলাম সুনীলকে। সবাই ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় যখন সুজল সরোবর (১৫,৬৭৫ ফুট) এর ক্যাম্পসাইট-এ গিয়ে পৌঁছলাম, শুনলাম সাপোর্ট মেম্বারদের আসতে দেরি হবে। ওদের একজনের শরীর বেশ খারাপ।

সুজল সরবর

একটা গুহার কাছে সবাই বসে রইলাম বৃষ্টি বাঁচিয়ে। সুবীর-দার দেওয়া বিস্কিট খেয়ে মনে হ'ল শরীরে প্রাণ ফিরেছে। একটু পরে সুবীরদা আর সন্দীপ গেল নিচে সরোবর থেকে জল আনতে। সন্ধ্যে নাগাদ সবাই এলো।

আমাদের ক্যাম্প থেকে একটু নিচে ওই অসুস্থ বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য আরো চার জন রয়ে গেল। আজ রাত দেড়টায় ডিনার! খেয়েই শুয়ে পড়লাম। আকাশের অবস্থা তথৈবচ।

১৪ তারিখ সকালে পাপ্পুর ডাকে ঘুম ভাঙলো। একটু পরে হাতে চায়ের কাপ। কিচেনে দফায় দফায় খাবার বানিয়ে নিচের সাপোর্ট মেম্বারদের পাঠানো হয়েছে। কখন বেরনো হবে জানা নেই। সুনীল বিধ্বস্ত এই অবস্থায়। পাপ্পু আর আমি সুনীল ও দেবেন্দ্রজি'র সাথে আলোচনা করে ঠিক করি, বেরনো হবে ১২টা নাগাদ। তখনও বৃষ্টি হয়েই চলেছে।

সিদ্ধান্তমতো ১২টা নাগাদই আমরা সুজল সরোবর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আবার সেই বোল্ডারের সাম্রাজ্য। হাঁচর পাঁচর করতে করতে যখন নন্দাবারি ধারে (১৬,০০০ ফুট) এসে দাঁড়ালাম তখন বেলা একটা। তখন বৃষ্টি থেমেছে। এবার নামার পালা। বেশ কিছুক্ষন নামার পর আবার বৃষ্টি। একটা পাথরের নিচে দাঁড়াই। এর মধ্যে আমাদের সাপোর্ট টিমও নেমে এসেছে। যে অসুস্থ ছিল তাকেও নামানো হয়েছে। এখন সে অনেকটাই ভালো। খানিক পরে আকাশ একটু পরিষ্কার হতে আমরা আবার হাঁটা শুরু করি। আজ বেশি দূরে নয়।

কচনি খাল-এর অনেক আগে একটা ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড (১৩,০২০ ফুট)। এখানেই তাঁবু ফেললাম। রাতে আলোচনায় স্থির হ'ল, কাল বৃষ্টি হলেও আমরা নিচের দিকে নামবো।

কাচনি খালের আগে ক্যাম্প

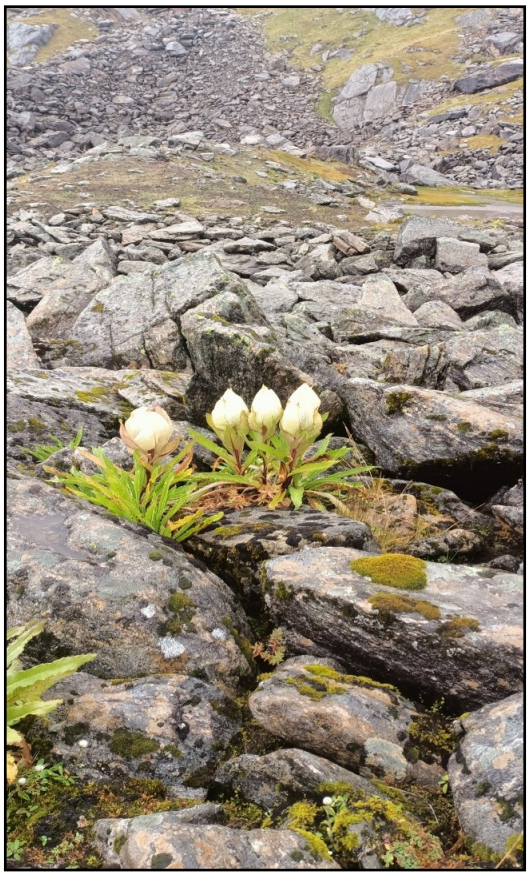

ব্রহ্মকমল

১৫ তারিখ সকাল সকাল পুরি-সবজি খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। কিছুক্ষন পর থেকে শুরু হলো হোয়াইট আউট, তার সাথে চলছে অনবরত বৃষ্টি। রাস্তা মোটা মুটি ভালই, মাঝে মাঝে কিছু বোল্ডার প্যাচ ছাড়া সেরকম অসুবিধে নেই। হঠাৎ আকাশ একটু পরিষ্কার হলে দুর থেকে দেখতে পেলাম ট্রেইল যেটা কাচনি খাল এ গিয়ে মিশেছে। আমরা অনেকটা উপর দিয়ে শর্টকাট এ পৌঁছলাম কাচনি খাল (১৪,৫২০ ফুট)। এখানে আমাদের ফোনে একঝলক সিগনাল পাওয়া গেল। প্রায় দিন দশেক বাদে সবাই বাড়িতে যোগাযোগ করল। এবার সবাই দেবেন্দ্রজি'র কাছে জানতে চায়, 'কতটা পথ বাকি?' দেবেন্দ্রজি বলে, 'ঔর থোড়াসা।' কিন্তু তার পর চলতে হয় ঘন্টা তিনেক। যাই হোক, তাও আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কতটা বাকি মদমহেস্বর পৌছতে?' তাঁর সেই এক উত্তর 'থোড়াই বাকি হ্যায়।'

এতদিন শুধু বোল্ডার টপকে টপকে রাস্তা বলে যে কিছু হয় ভুলেই গেছিলাম। এখন রাস্তা পেয়ে মনের আনন্দে হেঁটে চলেছি। কুয়াশায় দূরের কিছু দেখা না গেলেও অসুবিধে হচ্ছে না। একটানা উৎরাই পথে নামতে নামতে মাঝে কিছক্ষণ দাঁড়িয়ে পিছন দিকে দেখলাম, সুনীল দূরে অসুস্থ মেম্বারকে সাপোর্ট দিয়ে উপর থেকে নামাছে। আকাশ একটু পরিষ্কার হলে দূরে পাহাড়ের গায়ে দেখা গেলো মদমহেস্বর মন্দির। সেও অল্প সময়ের জন্য। আবার সব ঢেকে গেলো কুয়াশায়। এখন প্রায় দুপুর তিনটে, আমরা ঘাসজমি ছেড়ে

গাছপালা ,জঙ্গলের পথে চলছি। বেশ কিছুক্ষন চলে বিকেলের দিকে পৌঁছলাম মদমহেস্বর (১১,৫১৭ ফুট) মন্দিরের কাছে। ১৮০০/- টাকার বিনিময়ে মন্দির ট্রাস্টি ঠিক করে দিলো থাকা ও খাওয়ার জায়গা। এতদিন পরে বিছানা কম্বল দেখে মন ভালো হয়ে গেলো। সবাই তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে বসে যাই ভাতের থালা নিয়ে। সঙ্গে ডাল সবজি খেলাম প্রাণ ভরে। সন্ধ্যে ৭-টায় মন্দির খোলা হবে। একটু বিশ্রাম নিয়ে সোজা চলে আসি মন্দিরে। পুরোহিতের উচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ, ঘন্টার ধ্বনি, ধুপ চন্দনের গন্ধ, সব মিলিয়ে এক অনন্য পরিবেশ। ঘন্টা দেড়েক থাকলাম মন্দিরে। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। আমরা কজন ছাড়া কিছু স্থানীয় লোকজন ছিল। সাড়ে আটটার সময় চা খেয়ে কম্বলের নিচে সবাই বসে নিশ্চিন্ত মনে গল্প করি অনেক্ষণ। আগামীদিনের পথ নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। সবার মন হালকা। সবাই সুস্থ ভাবে ফিরে আসছি । সব মিলিয়ে আমরা বেশ নিশ্চিন্ত। তাই প্রাণ খুলে আড্ডা আর ফেলে আসা দিনের গল্পে মশগুল হয়ে গেলাম। রাত সাড়ে দশটার দিকে খাওয়ার ডাক পড়লো। রাতে ভাত, রুটি, সবজি, ডাল। পেট পুরে খেয়ে সোজা কম্বলের ভেতর। ওদিকে বৃষ্টির বিরাম নেই। টিনের চালে বৃষ্টির গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

জামা কাপড়, জুতো মোজা সব ভিজে। তাই পরে ব্রেকফাস্ট করে রওনা হলাম রাশি গ্রাম (৬,৪৪০ ফুট) এর উদ্দেশে। আমাদের সেই সহায়ক বন্ধুটি আজ অনেক সুস্থ। এখন আমাদের সাথে গল্প করতে করতে চলেছ। গ্রাম এ নেমে গাড়ি ধরে আমরা যাবো শ্রীনগর। সকাল ৯টায় বেরিয়ে বিকেল ৪-টের সময় পৌঁছলাম। শেষ তিন কিলোমিটার এত চড়াই যেনো মনে হচ্ছে পা চলছে না আর। এখানেই লাঞ্চ করলাম সবাই। এবার আর পায় হাঁটা নয়, গাড়িতে চেপে গান শুনতে শুনতে চলেছি শ্রীনগরের দিকে।

একদিকে মনে আনন্দ; আর হাঁটা নেই তো। আবার একই সঙ্গে মনখারাপ। এই পাহাড় পর্বত অরণ্য সব ছেড়ে ফিরে যেতে হবে শহর সভ্যতায়। ফিরতে তো হবেই, তবে খালি হাতে নয়...!